স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামল: যেসব খবর ছাপা যায়নি

সৈয়দ আবদাল আহমদ

স্বাধীন সংবাদপত্র একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের দর্পণ। গণতান্ত্রিক সমাজ মানেই বহুদলীয় সমাজ। আর বহুদল মানে বহুমতের অস্তিত্ব। সংবাদপত্র বহুমতের অস্তিত্ব প্রকাশের অধিকারে বিশ্বাস করে। তাই গণতন্ত্রের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্পর্ক নিবিড়। যেখানে অবাধ গণতন্ত্র, সেখানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতাও অবাধ। গণতান্ত্রিক সমাজেই সংবাদপত্র তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজে একটি স্বাধীন সংবাদপত্র সরকার ও জনগণের মধ্যে দোভাষীর কাজ করে থাকে। এতে লাভ হয় দেশের, লাভ হয় জনগণের।

তবে একটি স্বাধীন সংবাদপত্র সব দেশে সব কালেই স্বৈরশাসকদের জন্যে ত্রাস। তাই স্বৈরশাসক এবং সামরিক জান্তারা ক্ষমতা দখল করে প্রথমেই সংবাদপত্রের উপর খড়্গহস্ত হন। সংবাদপত্রকে বেড়ি পরিয়ে তারা জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে শৃঙ্খলিত করেন। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সমাজে সরকার ও জনগণের মধ্যে সংবাদপত্র যে সেতু বন্ধনের সুযোগ সৃষ্টি করে, স্বৈরশাসকরা তা বানচাল করে দেয়। সাংবাদিকতা হয়ে পড়ে শৃঙ্খলিত।

অবরুদ্ধ সংবাদপত্র কোনও সময়ই স্বৈরশাসকদের গণবিরোধী কর্মকাণ্ড, জুলুম, নির্যাতন, দুর্নীতির খবর জনসমক্ষে তুলে ধরতে পারে না। সংবাদপত্র তখন 'ক্যাপটিভ প্রেস'-এ পরিণত হয়। স্বৈরশাসকরা এভাবেই সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে নিজেদের শাসনক্ষমতা স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পায়। বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের সরকারগুলোই সংবাদপত্রকে দমন ও বশীভূত করার পন্থা অবলম্বন করে থাকে। এই সরকারগুলো সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে নানা পন্থায়। গোপনে অর্থ দেয়া, প্রকাশ্যে আর্থিক মঞ্জুরি, সরকারী বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদকদের পদক ও খেতাব বিতরণ, বড় বড় খবরের কাগজের মালিকদের মন্ত্রিসভায় কিংবা ভেতরের রাজনৈতিক পরিষদে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে নানাভাবে চলে সরকারের 'মূলা ও লাঠি' পদ্ধতির প্রদর্শন কৌশল। লাঠি কৌশল হচ্ছে স্বাধীনতা খর্বকারী নিবর্তনমূলক আইনের কঠোর প্রয়োগ, সংবাদপত্রের প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে চাপ দেয়া। যেমন সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ, নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ ও দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি। আর মূলা কৌশল হচ্ছে নগদ 'কিছু' দিয়ে মুখ বন্ধ রাখা।

তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের মধ্যে আমাদের দেশ এ ধরনের নির্যাতনের শিকার বেশি। বারবার স্বৈরশাসনের ফলে এদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের মনের দুরন্ত আশা আকঙ্ক্ষাকে কোনও সময়ই এদেশের সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে চিত্রিত করতে পারেনি। এদেশের সংবাদপত্র বারবার বেড়ি পরেছে।

বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার ইশ্‌তিয়াক আহমদের মতে: এই উপমহাদেশে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারত এবং পাকিস্তান এই দুই দেশের আইনগত ও সাংবিধানিক বিকাশ অধিকাংশ স্থলে এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে একেবারে পরস্পর বিরোধী পথে মোড় নেয়। স্বাধীনতার স্বল্পকাল পর ১৯৫০ সালে ভারতে সংবিধান বিধিবদ্ধ হয়। বর্তমানে ভারতে যে কোনও অসাংবিধানিক হস্তক্ষেপ থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বলিষ্ঠ নিশ্চয়তা রয়েছে। এই স্বাধীনতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের বিভিন্ন রায়ের ফলে সম্ভব হয়েছে এটি। পাকিস্তানে এই সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে কয়েকবার ছিল। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে সংবিধান বিধিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সামরিক শাসন জারি হওয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয়বার ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে 'যুদ্ধে জরুরী অবস্থা' জারি ও মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত করার সময় পর্যন্ত। এ সময়কাল বাদ দিলে ১৯৪৭ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত প্রায় পুরো সময়টাতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সাংবিধানিক গ্যারান্টির অনুপস্থিতিতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কঠোর ও নির্মম আইনসমূহ বিনা ঝুঁকিতে প্রয়োগ করা হয়েছে। ১৯৫৮ পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটে। মার্শাল ল' মারফত এই আইনগুলো আবার জোরদার করা হয় এবং পরবর্তীকালে সরকার পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স এ্যাণ্ড রুলস বলে সেন্সরশীপ আরোপ, সংবাদপত্র ও সাময়িকীর প্রকাশনার উপর বিধিনিষেধ এবং সংবাদপত্র বাজেয়াফত করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। এই অঞ্চলের সংবাদপত্রের জন্যে সেটা ছিল এক অন্ধকার যুগ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়ন এবং এই সংবিধানে বাক স্বাধীনতা, মত প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করায় আমরা আশার আলো দেখেছিলাম। কিন্তু বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ সেই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিস্যাৎ করে দেয়। বাক-ব্যক্তি, সংবাদপত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগের সকল তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে পেছনে ফিরে তাকালে যে কেউ সহজেই দেখতে পাবেন যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের মত একজন গণতন্ত্রীর হাতে এই আইনটি রচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যত স্বৈরশাসকদের জন্যে একটি স্বৈরাচারের সনদ রচনার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের ২৪ বছরের শাসনামলে এদেশের মানুষ বারবার স্বৈরশাসনের কবলে পড়েছে। কখনও তথাকথিত গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরশাসন, কখনও সামরিক শাসন। বহু সংগ্রামের বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। এদেশের সংগ্রামী মানুষের আশা ছিল, স্বাধীনতার পর তারা গণতান্ত্রিক মুক্ত সমাজের আস্বাদ পাবে। অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে, নিরঙ্কুশ হবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা। কিন্তু সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়। স্বাধীনতার ২০

বছরেও বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র আসেনি।

১৯৭৪ সালে জারি করা হয় বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৩ সালে জারি হয় প্রিন্টিং প্রেসেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স এ্যাক্ট। ১৯৭৫ সালে এদেশে প্রবর্তন করা হয় একদলীয় শাসন। একই বছর ১৬ জুন মাত্র চারটি সংবাদপত্র রেখে সকল সংবাদপত্রের প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়া হয়। রাতারাতি শত শত সাংবাদিক-কর্মচারী চাকুরিচ্যুত হন। সাংবাদিকরা এখনও ১৬ জুনকে কালো দিবস হিসেবে পালন করেন। এ অবস্থা থেকে জাতি কিছুদিনের জন্যে মুক্তি পেলেও ১৯৮২ সালে জাতির উপর আবারও স্বৈরশাসন চেপে বসে। স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদের দুঃশাসন চলে ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত। সংবাদপত্রের জন্যে এই অধ্যায়টি ছিল আরেকটি অন্ধকার যুগ। বলা যায়, কলঙ্কজনক এক অধ্যায়। জেনারেল এরশাদ এ সময় 'মূলা ও লাঠি' নীতি পুরোপুরি অনুসরণ করেন। এ নীতির সঠিক প্রয়োগ তার আমলেই ঘটে।

অতীতের মার্শাল ল' জারির কথা উল্লেখ করা যাক। সেসময় যখন সংবাদপত্রে সেন্সরশীপ আরোপ হতো, তখন দেখা যেতো একজন সরকারী অফিসার সংবাদপত্র অফিসে বসে সব কপি খুঁটিয়ে দেখে সরকারের মতে আপত্তিকর অংশগুলো কেটে বাদ দিয়ে ছাপানোর অনুমতি দিতেন। কিন্তু এরশাদ সাহেবের আমলে এভাবে আর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয়নি। তার আমলে টেলিফোনে বলে দেয়াই ছিল যথেষ্ট। সরকারের পিআইডি দফতর থেকে করা হতো এই ফোন। এটা ছিল নিত্যদিনকার ঘটনা। এরশাদ সাহেব এ ধরনের খবর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে প্রেস সেন্সরশীপ নয়, 'প্রেস এ্যাডভাইস' নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু তথাকথিত এই প্রেস এ্যাডভাইস ছিল আগেকার প্রেস সেন্সরশীপের চেয়ে অনেক ভয়াবহ। এই প্রেস এ্যাডভাইস অমান্য করার পরিণতি ছিল ভয়াবহ। সংবাদপত্রকে বেড়ি পরানোর এই পুরো প্রক্রিয়াটিই সম্পন্ন হতো আড়াল থেকে। বাইরের জনগণ এই অবস্থাটি যে কি, তা জানে না। তবে সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত, জেনারেল এরশাদ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কিভাবে হরণ করেছেন!

সরাসরি সেন্সরশীপ বরং একদিক থেকে ভালো। তাতে কি কি খবর ছাপতে পারবেন না, সেটুকুই শুধু নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু 'প্রেস এ্যাডভাইস' নামক তথাকথিত হিতোপদেশের আওতা অনেক বেশি সম্প্রসারিত। এতে সংবাদপত্রে কি ছাপা যাবে না শুধু তাই নয়, কি ছাপতে হবে এবং কিভাবে ছাপতে হবে সেটাও বলে দেয়া হতো। সংবাদপত্র অফিসে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পিআইডির এই ফোন আসতো। প্রতিটি সংবাদপত্র অফিসে এই প্রেস এ্যাডভাইসের একটি করে খাতা 'মেইনটেন' করা হতো। পিআইডির ফোন এলেই ঐ খাতায় তা লেখা হতো এবং সেই অনুযায়ী সংবাদপত্রে খবর ছাপা হতো।

এরশাদ সরকার বক্তৃতা-বিবৃতিতে বলতেন, তার আমলে সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু রাতে সংবাদপত্র অফিসে আসতো পিআইডির এই ফোন। জেনারেল এরশাদের শাস-নামলে যেসব দুর্নীতির ঘটনা ঘটেছে, তাকে জড়িয়ে যেসব নারীঘটিত স্ক্যাণ্ডাল হয়েছে এবং যেসব অনিয়ম, হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক নোংরামি হয়েছে, তার কিছুই পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়নি। জনগণ রাজপথে যেসব আন্দোলন করেছেন, তার সামান্য বস্তুনিষ্ঠ বিবরণও পত্রিকায়

তুলে ধরা যায়নি।

সংবাদপত্র অফিসে প্রতি রাতেই পিআইডি থেকে ফোন আসতো। পিআইডি'র এই 'প্রেস এ্যাডভাইস' লিখে রাখার জন্যে দৈনিক বাংলায় একটি রেকর্ড খাতা সযত্নে সংরক্ষণ করা হতো। দৈনিক বাংলার বার্তা সম্পাদক (পরে নির্বাহী সম্পাদক) ফওজুল করিম তারা ভাই এই খাতা সংরক্ষণের ব্যাপারে ছিলেন খুবই যত্নশীল। রেকর্ড খাতায় লেখা প্রেস এ্যাডভাইস-এর অধিকাংশই তারা ভাইয়ের নিজের হাতে লেখা। নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর পর দৈনিক বাংলার এই খাতাটি তারা ভাইয়ের কাছ থেকে অনুরোধ করে নিয়েছিলাম একটি নিবন্ধ তৈরির জন্যে। সেটি প্রথমে পিআইবি'র নিরীক্ষায় এবং পরে জাতীয় প্রেস ক্লাব স্মরণিকায় ছাপা হয়।

সেই তথাকথিত প্রেস এ্যাডভাইস-এর কিছু নমুনা দৈনিক বাংলার রেকর্ড খাতা থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যাকঃ
১১-৫-৮২ তারিখে পিআইডি থেকে জনৈক তথ্য অফিসার জানান, সরকারী ছবিগুলো এভাবে ছাপতে হবেঃ (১) সি এম এল-এর জাতীয় স্মৃতিসৌধ পরিদর্শনের ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় (২) উপদেষ্টা শাফিয়া খাতুনের ছবি প্রথম পৃষ্ঠায় নিচের দিকে (৩) আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের ছবি অষ্টম পৃষ্ঠায়। ১২-৬-৮৩ তারিখে ফোনে এ্যাডভাইস দেয়া হয়, সি এম এল-এর আজকের সব অনুষ্ঠানের খবরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষকদের সঙ্গে সাক্ষাতের খবরটির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এই খবরের শিরোনাম হবেঃ 'প্রাথমিক শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী ছিলেন এবং থাকবেন– এরশাদ',– এভাবে সরকারের পিআইডি দফতর থেকে প্রেস এ্যাডভাইজাররা যদি পত্রিকার খবর, শিরোনাম, ছবি এবং কোনটা কোন পৃষ্ঠায় কয় কলামে ছাপা হবে ঠিক করে দিতে পারেন, তাহলে সাংবাদিকদের কাজ কিছু আর অবশিষ্ট থাকে কি? সে সময় সব পত্রিকার চেহারা যে একই রকম ছিল, তার রহস্য এটাই।

সাংবাদিকরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তেন তখন, যখন সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা বিধিনিষেধ অমান্য করে রাজপথে সভা-সমাবেশ, হরতাল-মিছিল করতেন। সরকার এসব কর্মকাণ্ডে বাধা দিতো না। কিন্তু সংবাদপত্রে তার খবর ছাপতে ফোনে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হতো। বলা হতো, মিটিং-মিছিল হরতাল বেআইনী। তার খবর ছাপানো সামরিক আইনে দণ্ডনীয়। সাংবাদিকরা তখন পড়তেন উভয় সংকটে। খবর ছাপলে সরকারী নির্যাতন, না ছাপলে জনতার রোষ। খবর না ছাপানোর জন্যে পত্রিকা অফিস এ সময় আক্রান্ত হতো। কিন্তু সাংবাদিকদের এসময় করার কিছুই ছিল না। ২৯-৫-৮৩ তারিখে পিআইডি থেকে বলা হয়, বিমান বন্দর শুল্ক কর্মকর্তার মারা যাওয়ার খবরটি ছাপা যাবে না। ৭-৭-৮৩ তারিখে বলা হয়, নিহত বৈমানিকের কুলখানি বা বীমার টাকা পাওয়া যায়নি এ সম্পর্কে কিছুই ছাপা যাবে না।

সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় জেনারেল এরশাদের কবিতা ছাপার ঘটনা পাঠকরা নিশ্চয়ই দেখেছেন। এ ব্যাপারে পিআইডি থেকে টেলিফোনে নির্দেশ দেয়া হতো। বলা হতো, এরশাদ সাহেব নববর্ষ উপলক্ষে এই শিরোনামে একটি কবিতা লিখেছেন, কবিতাটি পাঠানো হচ্ছে।

এটি প্রথম পাতায় ডাবল কলামে বক্স করে ছাপতে হবে। কবিতা ছাপানোর ব্যাপারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এরশাদ সাহেবকে প্রশ্ন করায় বাসস'র সিনিয়র সাংবাদিক জাহাঙ্গীর হোসেনের চাকরিও যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে বাসস'র বিশেষ সংবাদদাতা জাহাঙ্গীর হোসেন প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিশ্বের কোথায়ও বড় কবিদের কোনও কবিতা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয় না। বর্তমানে বাংলাদেশের বড় কবি শামসুর রাহমানের কবিতাও এদেশের কোনও সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় ছাপা হয়নি। আপনার কবিতা প্রথম পাতায় ছাপা হয় কেন?' এর কিছুদিন পরই বাসস থেকে তার চাকরি চলে যায়। একইভাবে এরশাদের পত্রিকা দৈনিক জনতা রাজপথে পোড়ানোর জন্যে বাসস থেকে চাকরি যায় জনাব গোলাম মহিউদ্দিন খানের। এরশাদ সাহেব যখন ধীরে ধীরে রাজনীতিতে ঢোকার চেষ্টা চালালেন এবং রাজনৈতিক দলে ভাঙন ধরানোর উদ্যোগ নিলেন, তখনকার কিছু 'প্রেস এ্যাডভাইস'-এর নমুনার উদ্ধৃতি দেয়া যাক। ১৩-৮-৮৩ তারিখ: ধানমণ্ডি থানা যুব লীগের সহ-সভাপতি হুমায়ুন কবির মিলনের নেতৃত্বে ২৫ জনের নতুন বাংলা যুবসংহতিতে যোগদানের খবরটি পুরোপুরি ছাপতে হবে। ১৭-৪-৮৩: নতুন বাংলা যুব সমাজ ও ছাত্র সমাজের বিবৃতিটি ভালো করে ছাপতে হবে। ৯-৮-৮৩: জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের (মিলন) সাংবাদিক সম্মেলনের খবরটি ফলাও করে ছাপতে হবে। ২৮-৯-৮৩: ডাকসু'র জিএস শেখ হাসিনার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনের নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেবে। সেটি প্রথম পৃষ্ঠায় ভালোভাবে ছাপতে হবে (উল্লেখ্য, ডাকসু'র তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক জিয়াউদ্দিন বাবলুকে সরকারী দলে ভাগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া এভাবে শুরু হয়।)

প্রেস এ্যাডভাইসের অধিকাংশই অবশ্য বিভিন্ন ঘটনার খবর, বক্তৃতা-বিবৃতি না ছাপার নির্দেশ। সব লিখতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। তবুও রেকর্ড খাতা থেকে আরও কিছু উদাহরণ টানা যাক। ৩০-৫-৮২: জিয়ার মাজারে কোনও রাজনৈতিক নেতার ছবি তোলা যাবে না। ৮-৬-৮২: বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির বিবৃতির কিছুই ছাপা যাবে না। ২-৯-৮২: সাংবাদিকদের ব্যাজ ধারণ, দাবি, প্রতিবাদ জ্ঞাপন ও ধর্মঘট বা কর্মবিরতি সংক্রান্ত কোনও খবর যাবে না। ২৬-৪-৮২: কারফিউ লংঘনের দায়ে যেসব ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তার কোনও খবর ছাপা যাবে না। ৬-৯-৮২ তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস পালন সম্পর্কে ৯টি ছাত্র সংগঠনের বিবৃতি যাবে না। ১৬-৯-৮২: বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্টারিংয়ের দায়ে ছাত্রদের গ্রেফতার সম্পর্কে পুলিশ খবর দিলে যাবে, অন্যথায় যাবে না। ১৭-১০-৮২: সুপ্রীম কোর্টের বেশ কিছু আইনজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কোনও খবর যাবে না। ৩-১১-৮২: ৩ নবেম্বর উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে কিংবা বনানী গোরস্থানের সামনে পুলিশের লাঠিচার্জ, গুলি ও গ্রেফতারের খবর যাবে না। ৮-১১-৮২: (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের ঘটনাবলীর কিছুই যাবে না, (খ) একটি সরকারী ভাষ্য দেয়া হবে, সেটি ছাপতে হবে। ২১-১১-৮২: ছাত্রদের সাংবাদিক সম্মেলন সংক্রান্ত কোনও কিছু ছাপা যাবে না। ২৪-১১-৮২: ডিইউজে'র 'প্রতীক কলম বিরতি' পালনের কোনও খবর যাবে না। ১-১-৮৩: বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের সভা, মিছিল ইত্যাদি খবর যাবে না। ৩-১-৮৩: রাজশাহী জেলে কয়েদীদের অনশন সম্পর্কে কোনও খবর যাবে না। ২১-১-৮৩: জেনারেল

এরশাদের ১৪ জানুয়ারির বক্তব্যের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিবৃতি যাবে না। ৭-২-৮৩: একুশে উদযাপন উপলক্ষে কোনও মহলেরই বিবৃতিতে রাজনৈতিক বক্তব্য, তথা সামরিক আইন তুলে নেয়া, গণতন্ত্র প্রদানের দাবি ইত্যাদি বক্তব্য যাবে না।

১৯৮৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি ছাত্র মিছিলে গুলিবর্ষণে বেশ কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়। সেই ঐতিহাসিক ১৪ ফেব্রুয়ারির (শিক্ষা দিবস) কোনও খবরই সেদিন পত্রিকায় ছাপা হয়নি। এ সম্পর্কে যেসব ব্রিফিং ছিল, অর্থাৎ পিআইডি থেকে সংবাদ ছাপার উপর যেভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল, তার বিবরণঃ ১৪-২-৮৩: ছাত্রদের মিছিলে পুলিশের গুলি, হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি পটভূমিতে আজ ঢাকা শহরে যা ঘটেছে, তার কোনও খবর, ছবি ছাপা যাবে না। ১৫-২-৮৩: আজকের ঘটনাবলীর প্রেসনোটসহ কিছুই যাবে না (সরকারই প্রেসনোট দিয়েছিল। কিন্তু পরে সেই প্রেসনোটও ছাপতে দেয়নি)। ৪-৩-৮৩: শেখ হাসিনার বিবৃতিসহ কোনও রাজনৈতিক বিবৃতি যাবে না। ১৬-৫-৮৩: ১৪টি ছাত্র সংগঠন, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা ডাকসু'র কোনও খবরই যাবে না। ১৯-৫-৮৩: খুলনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে শিক্ষা মন্ত্রীকে কালো পতাকা দেখানোর খবর ছাপা যাবে না। ৭-৬-৮৩: আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদের ধর্মঘট পালনের খবর যাবে না। ১৫-৬-৮৩: বিচার দিবস পালন সম্পর্কে কিছুই যাবে না। ৩০-১০-৮৩: ১ নবেম্বরের কর্মসূচীর সপক্ষে কিছুই যাবে না, তবে এ কর্মসূচীর নিন্দা করে ৫০০ আইনজীবীর একটি বিবৃতি আসবে, তা ভালোভাবে ছাপতে হবে। ২৮-১১-৮৩: ১৫ দল, ৭ দল, ১০ দল বা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ছাপা যাবে না। ২১-১২-৮৩: রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ; তাই কোনও রাজনৈতিক খবর ছাপা যাবে না।

এরশাদ শাসনামলে সামরিক শাসন জারি পর্যন্ত 'প্রেস এ্যাডভাইস' এর কিছু নমুনা দেয়া হলো। সামরিক শাসন তুলে নেয়ার পরও একইভাবেই 'প্রেস এ্যাডভাইস' দিয়ে খবর প্রকাশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। তার কিছু নমুনা তুলে ধরা যাক। ২-১০-৮৪: গতকাল গলফ ক্লাব এলাকায় যে ডাকাতি হয়েছে, তার খবর যাবে না। ৭-১০-৮৪: ময়েজউদ্দিন হত্যার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ জড়িত বলে ড. কামাল হোসেন যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা কোনওভাবেই ছাপা যাবে না। ৯-১০-৮৪ (আইএসপিআর): হোটেল সোনারগাঁয়ে টেলি কম্যুনিকেশন সম্পর্কে সেমিনার হচ্ছে। তাতে আর্মির কোনও নাম এলে ছাপা যাবে না। ১১-১০-৮৪: অলি আহাদের মামলার শুনানি সম্পর্কে কিছু যাবে না।

১৯৮৪ সালের ১৪ অক্টোবর ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতে ইসলামী ঢাকায় মহাসমাবেশ করে। স্মরণকালের মধ্যে এটি ছিল বৃহত্তম মহাসমাবেশ। এদিনের কোনও খবর পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অবশ্য সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদে এক দিন পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পিআইডি থেকে এদিন যে ব্রিফিং আসে, তাহলো: ১৪-১০-৮৪: ঢাকায় ১৫ দল, ৭ দল ও জামায়াতের গণ সমাবেশের কোনও খবর যাবে না। সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে ১৫ দলের প্রস্তাব যাবে না, চীফ অব স্টাফ সম্পর্কে খালেদা জিয়ার বক্তব্য যাবে না। বিচারপতি সাত্তার ও মীর্জা গোলাম হাফিজের বক্তব্যের কিছুই যাবে না। খবরে কোনও আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেয়া যাবে না। ২০-১২-৮৪: ২২-২৩ ডিসেম্বর ৪৮ ঘন্টা হরতাল সম্পর্কে

কোনও খবর যাবে না। ২১-১২-৮৪: রাজনীতি বন্ধ: রাজনৈতিক কোনও খবর যাবে না। ১-৩-৮৫: রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও তার কোনও অংশের সমালোচনা করা যাবে না, আস্থা ভোটের সমালোচনা যাবে না, সামরিক আইন, আদেশ ও সামরিক আদালতের সমালোচনা যাবে না। ধর্মঘট মিছিল, সভা-সমাবেশের খবর যাবে না। ১৫-৪-৮৫: পয়লা বৈশাখে রমনা বটমূলের অনুষ্ঠানে মঞ্চ দখলের খবর যাবে না। ১১-৫-৮৫: চাঁপাই নবাবগঞ্জে জনসমাবেশে পুলিশের গুলিতে ৬ জনের মৃত্যুর খবর যাবে না। ২৯-৫-৮৫: লাশের ছবি ছাপা যাবে না। ৮-৬-৮৫: রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর পদবী ছাপা যাবে না, শুধু নাম ছাপা যাবে। ১৬-৮-৮৫: ডিফেন্স সার্ভিসের কোনও সদস্য চোরাচালানের দায়ে গ্রেফতার হয়েছে, এমন খবর যাবে না। জাতীয় ফ্রন্ট ঘোষণার খবর যাবে। তবে কোনও ব্যক্তি, সংবাদ সম্মেলন বা প্রেস রিলিজের মাধ্যমে তা যাবে না। ৯-৯-৮৫: বনানী এমপি পোস্টের কাছে এমপি ও জনতার মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে, এ খবর যাবে না। ২২-৯-৮৫: পাটের বিএসএস পরিবেশিত খবর বড় করে ছাপতে হবে। ২৩-৯-৮৫: শেখ হাসিনার সাংবাদিক সম্মেলনের এক লাইনও যাবে না। ২৫-৯-৮৫: প্রেসিডেন্টের চট্টগ্রামে ভাষণ; 'আমার জনদল' এই কথা যাবে না। ২১-১০-৮৫ আজ প্রেসিডেন্ট এরশাদ টিএসসি'র পাশ দিয়ে যাবার সময় ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও বিক্ষোভ দেখানো হয়। তার একটি লাইনও যাবে না। ২৯-১০-৮৫: কাজী জাফরের চিনি সংক্রান্ত এনা'র খবর 'হাইলাইট' হবে। ১০-১১-৮৫: প্রেসিডেন্টকে হরতাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। এই বিষয়গুলো যাবে না।

হরতাল শব্দটিই লেখা যাবে না। জেনারেল এরশাদের নারী কেলেঙ্কারি এদেশে বহুল আলোচিত। তবে এ সম্পর্কে এরশাদের পতনের আগে এদেশের পত্র- পত্রিকায় কোনও খবরই ছাপা যায়নি। বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় এসব খবর ফলাও করে প্রচার হয়েছে। ঐ সময়ে সংবাদপত্রে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, তার কিছু বিবরণ: ৪-৮-৮৬: লণ্ডনের জনমত পত্রিকায় বেগম মেরীর বিবাহিত জীবন সম্পর্কে যে খবর ও ছবি ছাপা হয়েছে, তার পুনর্মুদ্রণ কিছুই করা যাবে না। ৮-৯-৮৬: লণ্ডন অবজারভারে এ সম্পর্কে যে খবর ছাপা হয়েছে, তারও পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না। একইভাবে ওয়াশিংটনের পত্র-পত্রিকায় ও ভারতের পত্র-পত্রিকায় মেরী, জিনাত ও অন্যান্যের সম্পর্কে যে খবর বেরিয়েছে, তা পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

২৪-১-৮৮: আজ চট্টগ্রামে পুলিশের গুলিতে নিহতদের সংখ্যা পুলিশের প্রেসরিলিজে যা আছে, সেটাই ছাপতে হবে, প্রকৃত সংখ্যা ছাপা যাবে না। ভায়োলেন্সের কোনও ছবি ছাপা যাবে না। ১১-১-৮৮: বেগম খালেদা জিয়া চট্টগ্রামে নিহতদের আত্মীয়-স্বজনকে দেখতে যান। তার ছবি ও খবর যাবে না। নিহতদের সম্পর্কে হৃদয়স্পর্শী কোনও বর্ণনাও যাবে না। ৪-২-৮৮: আজকের সংবাদে কামরুল হাসানের যে স্কেচ ছাপা হয়েছে, তার পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না। ১১-২-৮৮: ইউপি নির্বাচনে হাঙ্গামায় নিহতদের সংখ্যা সরকারী সংখ্যার চেয়ে বেশি দেয়া যাবে না।

২০-৬-৮৮: বিশ্ববিদ্যালয়ে হাসনা মওদুদকে লাঞ্ছিত করার ঘটনার ছবি ছাপা যাবে না। তবে ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণনা সরকারী প্রেসনোট থেকে ছাপতে হবে। এ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

ভিসিকে টেলিফোনে যে কড়া কথা বলেছেন, তা ছাপা যাবে না। ১-৯-৮৮: প্রেসিডেন্ট আজ ডিএ্যাণ্ডডি বাঁধ পরিদর্শনে গেলে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, তা ছাপা যাবে না। ১১-১১-৮৮: রিগ্যান-এরশাদ বৈঠকে সময় হোয়াইট হাউসের সামনে যে বিক্ষোভ হয়েছে, তা ছাপা যাবে না। ২৫-৯-৮৯: মীর শওকত আলী সম্পর্কে কোনও খবর যাবে না। ৮-৩-৮৯ লণ্ডনে প্রকাশিত 'সৈনিক কথা' বই থেকে যে কোনও উদ্ধৃতির প্রচার প্রকাশ নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য, বইটি এরশাদের কীর্তিকলাপ নিয়ে লেখা। ৩-২-৯০: এরশাদের ওয়াশিংটন সফর সম্পর্কে বিবিসি'র রেডিও মনিটরিং করা যাবে না। ৯-৮-৯০: রাজশাহীতে স্বাস্থ্য নীতির পক্ষে মিছিলের খবর ভালো করে ছাপতে হবে। ১৩-৯-৯০: সোভিয়েত কর্মকর্তার রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা সংক্রান্ত খবর ছাপা যাবে না। ১৯-১০-৯০: সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনও খবর ছাপা যাবে না। এই সামান্য ক'টা উদাহরণ থেকেই ধারণা করা সম্ভব, এরশাদ শাসনামলে সংবাদপত্র কেন লিখতে পারে নি।

১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জেহাদ' নামে একজন ছাত্র মারা যাওয়ার পর ছাত্রঐক্য গঠিত হয়। এরপর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক দলগুলো চূড়ান্ত আন্দোলন শুরু করে এবং সমাবেশ, মিছিল হরতাল চলতে থাকে। এর ফলেই সরকার ২৭ নবেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন এবং সংবাদপত্রে খবর প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সাংবাদিক সমাজ এর প্রতিবাদে সকল পত্র-পত্রিকায় ধর্মঘট শুরু করেন। এরশাদ ক্ষমতাচ্যুত হলে ৫ ডিসেম্বর সংবাদপত্র চালু হয়। এই প্রথমবারের মত বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় কোনও বাধা ছাড়াই প্রকাশিত হয় বিভিন্ন দুর্নীতি, কেলেঙ্কারি, অনিয়ম, স্ক্যাণ্ডাল ও রাজনৈতিক খবর।

এরশাদের পতনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী বিএনপি'র নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসে। আবার এ সরকারের আমলে সর্বাধিক সংখ্যক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। পত্র-পত্রিকাগুলো স্বাধীনভাবে লিখতে পেরেছে। কোনও বাধা আসেনি।

এরশাদ শাসনামলে সংবাদপত্রকে শৃঙ্খলিত করে রাখার ফলে জাতীয় সংবাদ মাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। সাধারণ মানুষ দেশের খবর জানার জন্যে বাধ্য হয়ে বিদেশী বেতারের উপর নির্ভর করতে শিখেছে। সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে তারপর। মানুষ আবার দেশের গণমাধ্যমের দিকে ঝুঁকেছেন। পত্র-পত্রিকার প্রচার সংখ্যা আগের চেয়ে বেড়েছে। পত্রিকাগুলোতে খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। সরকার কিংবা বিরোধী দল, সবার দিকেই পত্র-পত্রিকার সজাগ দৃষ্টি ছিল। গণতান্ত্রিক সমাজের আস্বাদ এখানেই।

লেখক দৈনিক আমার দেশ -এর বিশেষ সংবাদদাতা